অনীক

সমাজ-বদলের লড়াই, সশস্ত্র সংগ্রাম ও আজকের ভারত

দীপংকর চক্রবর্তী

এক

যুগ যুগ ধরে দার্শনিকরা তাঁদের দর্শনের মাধ্যমে জীবন ও জগৎকে বোঝার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু মার্ক্স-এঙ্গেল্স তাঁদের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে দুনিয়াটাকেই পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন। একথা অনেকেরই জানা। তার সঙ্গে একথাও জানা যে,আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের শুরু থেকেই বহু সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী ব্যাপক মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা ও শোষণ-নির্যাতনে বিচলিত হয়ে এই সমাজের পরিবর্তন চেয়েছেন, কিন্তু মার্ক্স-এঙ্গেল্স্ই প্রথম এই উপলব্ধিতে পৌঁছোন যে, সেজন্য একান্তভাবে আবশ্যিক এই সমাজের মূল নিয়ন্ত্রণ যার হাতে, সেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকেই শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে পাল্টা এক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। ফলত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-এর স্ব-ঘোষিত অনুসারী কমিউনিস্টদের উপরই দায়িত্ব এসে পড়ে এই কাজটা, অর্থাৎ নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকে সমূলে উৎপাটিত করার কাজটা সম্পূর্ণ করার।

এবং সেখানেই যতো সমস্যা আর গন্ডগোল। কারণ সমাজ-বদল কথাটা মুখে উচ্চারণ করাটা সহজ হলেও করাটা অতো সহজ নয়। প্রচণ্ড শক্তিধর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা একদিকে ছলে-বলে-কৌশলে এবং চরম ক্ষমতামদমত্ততা ও চণ্ডশক্তির প্রয়োগে তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে দশ হাজার বছরের শ্রেণীসমাজের অভ্যাস, ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই শ্রেণীসমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য। অন্যদিকে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদেও কোনো বাঁধা-ধরা ফর্মুলা নেই যে, সেটার সাহায্যে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে সেই বিপ্লবটা করে ফেলা যাবে। এমনকি বিপ্লব রপ্তানিযোগ্য পর্যন্ত নয় যে,বিপ্লব-সফল কোনো দেশ থেকে সেটাকে আমদানি করে নেওয়া যাবে।প্রত্যেক দেশের সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই সেদেশের বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল ঠিক করতে হবে। আর সেটা সফলভাবে একবার সমাধা করা হয়ে গেলেও সমস্যা মিটবে না, অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে তাকে চালিয়ে যেতে হবে, নাহলেই বুর্জোয়ারা আবার ক্ষমতা দখল করে বসবে, ঠিক যেমনটি ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে, ঘটেছে চীনে। বোঝাই যাচ্ছে, কাজটা খুব সহজ নয়। বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়েই দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাস করতো, কাজটা সহজ হলে এতোদিনে প্রায় সমগ্র মানবসমাজেরই তো সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাস করার কথা!

যাই হোক, কমিউনিস্টরা ভবিষ্যতে শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যকেসামনে রেখে সে পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পুঁজিবাদী সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।তার প্রাথমিক শর্ত যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকে সমূলে উৎপাটিত করা, তা নিয়ে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে মূলত আর বিতর্কের অবকাশ ছিল না। তবে অবশ্যই গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ এক বিতর্কের ভিত্তি প্রথম থেকেই ছিল সেই সামাজিক উত্তরণের পদ্ধতি নিয়ে। এ নিয়ে গত প্রায় দেড়শো বছর ধরে দক্ষিণপন্থী ও অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে তো বটেই, এমনকি কমিউনিস্টদের নিজেদের মধ্যেও বিতর্ক চলছে। আর তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, এমনকি প্রথমে, মার্ক্স-এঙ্গেলস যখন *কমিউনিস্ট ইস্তাহার* লেখেন তখনও, সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। ১৮৭১-এ পুঁজিবাদী সমাজের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্যারি কমিউনের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে, বিরাজমান বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে *বল পূর্বক* আমূল উৎপাটিত করাটা সমাজ-বিপ্লবের সাফল্যের জন্য একান্ত আবশ্যিক। পরবর্তীকালে লেনিন এই সিদ্ধান্তটির তাত্ত্বিক রূপ দেন, এবং বিভিন্ন দেশে, বিশেষত রাশিয়ায় ও চীনে বিপ্লবের বাস্তব অনুশীলনের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে এটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, ফলে বিতর্ক অনেকটাই স্তিমিত হয়ে আসে।

দুই

কিন্তু সোভিয়েত দেশে স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ চক্র কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর, বিশেষত ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের পর থেকে তারা আন্তর্জাতিকভাবে কমিউনিজম-এর পতাকা তুলেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই মৌলিক সিদ্ধান্তটিকে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে উল্টে দেবার এক চক্রান্ত শুরু করে। তাদের মতে, রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই শান্তিপূর্ণভাবে সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করতে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও বিগত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে বিতর্ক শুরু। সেই বিতর্ক, এবং তার সঙ্গে সুবিধেবাদী

ও ব্যক্তিগত নানা খেয়োখেয়ির পরিণতিতে ১৯৬৪তে ভারতের পার্টি দুভাগে বিভক্ত হয়। মূল সিপিআইতে যারা থেকে যান, তাঁরা ছিলেন ক্রুশ্চভপন্থার অনুসারী।

আর নতুন পার্টি সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্ব সিপিআইকে 'আধুনিক সংশোধনবাদী' আখ্যা দিয়ে তাদের কর্মসূচিতে ঘোষণা করে ছিলেন ঃ শুধুমাত্র সংসদের মাধ্যমে নয়, সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত গণসংগ্রামের সমন্বয় ঘটিয়েই সমাজ বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভব হবে। ১৯১৯ সালে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে লেনিন নিজে দুনিয়ার কমিউনিস্টদের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে এই তত্ত্বই তুলে ধরেন, কিন্তু তিনি তার সঙ্গে এই *আবশ্যিক* শর্তটি যোগ করেন যে, সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় *অতি অবশ্যই সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামকে প্রধান ভূমিকা দিতে হবে— তার স্বার্থে ও তার সহায়ক হিসেবেই কেবল সংসদীয় সংগ্রাম চালাতে হবে*। সিপিআইএম নেতারা লেনিনের তত্ত্বের এই নির্ধারক অংশটি সুকৌশলে ছেঁটে বাদ দিয়ে সংসদ-সর্বস্বতার গোলকধাঁধায় নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনাটিকে জিইয়ে রেখে-ছিলেন। ওই কর্মসূচি গ্রহণের সময় লেনিনের সেই ছেঁটে-বাদ-দেওয়া নির্ধারক শর্তটি যুক্ত করার দাবি উঠলেও, সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ফলত পার্টির নেতারা সচেতনভাবেই লেনিনের তত্ত্বকে বিকৃত করেছিলেন— এমন অভিযোগ যদি ওঠে, তবে তার উত্তর দেওয়া মুস্কিল।

তবু এটা ঘটনা যে, সিপিআই(এম)-এর মধ্যেই তখন বিপ্লবের আকাঙ্খায় অধিকাংশ জঙ্গি কর্মী সমবেত হয়েছিলেন এবং বিপুল উৎসাহে নানা দাবিতে ব্যাপক গণসংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। সিপিআই(এম) নেতারা মুখে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের পক্ষে ওকালতি করার মতো মূর্খতা না দেখালেও, কার্যত 'বলপূর্বক' উত্তরণের প্রশ্নে 'বলপ্রয়োগ'-এর বিষয়টি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক-ভাবে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখতেন, এবং গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত সংগ্রামী চেতনা ও ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনকে একমাত্র সংসদীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হবার লক্ষ্যে পরিচালিত করতে বেশি সক্রিয়তা দেখাতে থাকেন। বিপ্লবের লক্ষ্যে 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে' লড়াই করে গড়ে ওঠার দাবিদার এই পার্টিটা ক্রমেক্রমে 'সংশোধনবাদ' শব্দটিকেই তাদের মতাদর্শগত অভিধান থেকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিয়েছিল,সুপরিকল্পিত -ভাবে সংসদ-সর্বস্বতার কানা গলিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হবার প্রক্রিয়াটিই প্রধান হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। পরিণতিতে, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা এই তিনটি অঙ্গরাজ্যে একাদিক্রমে ক্ষমতাসীন থাকাটাই কার্যত তাদের 'সমাজ-বিপ্লব'-এর 'আশু লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট সরকারের 'গণআন্দোলনের স্বার্থে সরকার পরিচালনা'-র শ্লোগান 'বামফ্রন্ট সরকারকে চোখের মণির মতো টিকিয়ে রাখা'-র শ্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রথম দিকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে জনগণের কল্যাণমূলক কিছু সংস্কার মূলক কাজ করার ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থার মধ্যে জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান যে কিছুতেই করা যায় না— জনগণকে সে-সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য তাদেরই কর্মসূচিতে বিধৃত নির্দেশ তারা 'বিস্মৃত' হয়ে গেলো। এবং শেষ পর্যন্ত এই বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতায় থাকা মধ্য ও দক্ষিণপন্থী সেবাদাস অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির মতো এই দলটিও 'জনগণের স্বার্থ'-এর দোহাই দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের প্রদর্শিত নিও-লিবারাল অর্থনৈতিক পথে চলতে শুরু করলো। ফলতএবং বাস্তবত 'বলপূর্বক' দূরের কথা, সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন করার ঘোষিত লক্ষ্যটিই ভারতের বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে ছলে-বলে-কৌশলে মন্ত্রিত্বে টিকে থাকার লক্ষ্যে, এবং সমাজ-বিপ্লবের লক্ষ্যটি শুধু ধূসর অতীতের প্রায়-বিস্মৃত কোনো স্বপ্নের মতো কয়েক বছর অন্তর তাদের তাদের পার্টি-কংগ্রেসগুলিতে মন্ত্রোচ্চারণের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

তিন

সিপিআই(এম) নেতৃত্বের এই দ্বিচারিতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠার প্রথম পর্বেই তার বিরুদ্ধেপ্রতিবাদে বেশ কিছু জঙ্গি কর্মী পার্টি ছেড়ে ছিলেন। ভাঙনের এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল ১৯৬৭ সালে, পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-সহ কংগ্রেস-বিরোধী দক্ষিণ-বাম বিভিন্ন দলের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে, দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে স্থানীয় সিপিআই(এম) কর্মীদের সংগঠিত জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের উপর পুলিশি গুলি চালনার প্রতিবাদে। খুব দ্রুত নকশালবাড়ির আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নকশাল-পন্থীদের অধিকাংশই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৬৯ সালে জন্ম দিয়েছিলেন একটি নতুন পার্টি সিপিআই (এম-এল)-এর। এই নতুন পার্টিটি সঠিকভাবেই সংসদ-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বলপূর্বক বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে নতুন সমাজ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু সিপিআই(এম)-এর কার্যত দক্ষিণপন্থী লাইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে পার্টিটি আবার শিকার হয়েছিল উগ্র 'বামপন্থা'-র। বামপন্থার ঐতিহাসিক শিক্ষা হচ্ছে ঃ একদিকে যেমন বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো মোহ না রেখে তাকে বল পূর্বক সমূলে ধ্বংস করতে হবে, ঠিক তেমনি সেই সশস্ত্র লড়াইকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করতে গিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, আইনি ও বেআইনি, সম্ভাব্য সমস্ত পন্থাকে কাজে লাগাতে হবে। বুর্জোয়া পার্লামেন্টের মৌলিক গণবিরোধী চরিত্র সত্ত্বেও নির্বাচন-সহ সমস্ত আইনি লড়াইকে সম্ভবমতো ও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে জনগণের ঐক্য এবং বিপ্লবী চেতনা ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। লেনিন, মাও প্রভৃতি সমাজ বিপ্লবের সমস্ত রূপকারই বারবার নিজ নিজ দেশের বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই অবস্থানের উপর জোর দিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতে বাস্তব কর্মসূচি নিয়েছেন। সিপিআই(এম-এল) ঐতিহাসিক

অভিজ্ঞতা প্রসূত বামপন্থার এই মৌলিক শিক্ষাকে একপেশেভাবে বর্জন করেছিল। সিপিআই (এম)-এর ভ্রান্ত সংসদ-সর্বস্বতার লাইনের বিরোধিতাকে নেতৃত্ব শ্রমিক-কৃষক-যুব-ছাত্রদের সমস্ত গণ-সংগঠন ও গণআন্দোলনের বিরোধিতায় পর্যবসিত করেছিলেন, এবং তার বিপরীতে জোর দিয়েছিলেন 'গেরিলা যুদ্ধ' তথা গণআন্দোলন-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিহত্যার উপর। তাদের এই গণ-বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রশক্তি সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলত, অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের এক অনুপম মহাকাব্য রচিত হলেও, শেষ পর্যন্ত কয়েক বছরের মধ্যে নকশালপন্থীদের আন্দোলন চরম ব্যর্থতা বরণ করেছিল, এবং প্রকৃত বামপন্থার বিকল্পকে দূরায়ত করে দিয়েছিল।

চার

এই মুহূর্তে সিপিআই(মাওবাদী) দলটি চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সিপিআই(এম-এল) পরিচালিত নকশালবাড়ি আন্দোলনের সেই মূল ধারাকেই বহন করে চলেছে। তাদের সেই পূর্বসূরীদের মতো তারাও তাদের সমস্ত কর্মসূচি তথা কর্মকাণ্ডকে বিন্যস্ত করেছে মাও-নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বর্জিত বর্তমান যুগ সম্পর্কে একটি অতি 'বাম' ভ্রান্ত ধারণার উপর। বিগত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যখন সোভিয়েত ও চীনের পার্টির মধ্যে সুদূর প্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন বিরাট এক মতাদর্শগত বিতর্ক চলছিল, তখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্তালিন-কৃত বর্তমান যুগের চরিত্রায়ন (*'বর্তমান যুগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ'*, আর *'লেনিনবাদ হচ্ছে এযুগের মার্কসবাদ'*) নিয়ে কোনো মতদ্বৈততা ছিল না। কিন্তু ঠিক ওই সময়েই চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নেপথ্যে চীন বিপ্লব তথা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা মাওসেতুং-এর জয়ধ্বনি তুলতে তুলতেই একটি আপাত-'বাম' লাইন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তারাই প্রথম বর্তমান যুগ সম্পর্কে বিরাজমান ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ঘোষণা করে : বর্তমান যুগটি হচ্ছে সাম্রাজ্য-বাদের সামগ্রিক ধ্বংসের আর সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্জনের যুগ, আর মাও সেতুঙ চিন্তাধারা হচ্ছে এযুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। চীনের পার্টির নবম কংগ্রেসে (১৯৬৯)গৃহীত পার্টি-সংবিধানে পর্যন্ত এই বক্তব্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু খুব শিগগিরই মাও-এর উদ্যোগে এই আপাত-'বাম' কুচক্রীদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায় এবং ১৯৭১-এ লিন পিয়াওকে এদের প্রধান নেপথ্য মদতদাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের সিপিআই (এম-এল) কিন্তু বর্তমান যুগ সম্পর্কে সেই অবাস্তব উচ্চাশাবিশিষ্ট চরিত্রায়নই অনুসরণ করতে থাকে। এর পর চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসে (১৯৭৩) গৃহীত পার্টি-সংবিধানেও পূর্বোক্ত ভ্রান্ত বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়, রাজনৈতিক রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বর্তমান যুগ সম্পর্কে পুরোনো মূল্যায়নের (*'লেনিনবাদ হচ্ছে এযুগের মার্কসবাদ'*) পুনরাবৃত্তি করা হয়। শুধু তাই নয়, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত লিন পিয়াও'র *জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক* বইটিতে বলা হয়েছিল, চীন বিপ্লবের এক বিশেষ অবস্থায় গেরিলা যুদ্ধই *সামরিকভাবে* জনগণকে সমবেত করার একমাত্র পন্থা ছিল। নকশালপন্থীরা সেটারও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে ভারতের সামগ্রিক বিপ্লবী লড়াইয়ের ক্ষেত্রেই গণআন্দোলনের পথ পরিহার করার এবং গেরিলা যুদ্ধ, অর্থাৎ ব্যক্তিহত্যাকেই জনগণকে সমবেত করার একমাত্র পন্থা হিসেবে তুলে ধরে মৌলিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও সেতুং চিন্তাধারা-বিরোধী এক অবস্থান গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালেই পিকিং-এ সিপিআই (এম-এল)-এর প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার সময় চীনের পার্টি-নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নকশালপন্থীদের শ্রমিক-কৃষক-যুব-ছাত্রদের সমস্ত গণসংগঠন ও গণআন্দোলন-বিরোধিতার এবং একপেশেভাবে গণআন্দোলন-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-হত্যার লাইনের উপর নির্ভরতার লাইন সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। আজও ভারতের 'মাওবাদীরা' মূলত সেই ভ্রান্ত লাইনেরই অনুসরণ করে চলেছেন।

বিষয়টি একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আসলে সমাজবিপ্লবের প্রক্রিয়াটি কোনোক্রমেই সশস্ত্র সংগ্রাম বনাম অ-সশস্ত্র এই দুই রূপের সংগ্রামের পন্থার দ্বন্দ্ব নয়, বরং তাদের সঠিক সমন্বয়েরই প্রক্রিয়া। কারণ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎপাটিত করতে হলে সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে যেতেই হবে, কিন্তু সেই সশস্ত্র লড়াইয়ের কার্যকর প্রস্তুতিপর্বে আইনি ও বেআইনি, সশস্ত্র ও অ-সশস্ত্র সমস্ত পদ্ধতিকেই সম্ভবমতো কাজে লাগাতে হয়। মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন বা মাওয়ের লেখা ও অভিজ্ঞতার সার-সংকলন থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দেবার পরিসর বা প্রয়োজন নেই, এক কথায় বলা যায়, অন্তত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাওসেতুং চিন্তাধারার তত্ত্ব ও এযাবৎ কালের অনুশীলন এই শিক্ষাই তুলে ধরে। কিন্তু 'মাওবাদীরা' প্রথম থেকেই সমাজ-বিপ্লবকে গণ্য করছেন অ- সশস্ত্র সংগ্রাম বনাম সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বন্দ্ব হিসেবে, সমন্বয় হিসেবে নয়। তাঁদের রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কিত দলিলে তাঁরা বলেছেন, ভারত একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, প্রাক্-বিপ্লবী চীনের সঙ্গে মৌলিক সাদৃশ্যের কারণে চীন বিপ্লবের পথই হবে ভারতীয় বিপ্লবের পথ; এরকম একটি দেশে, যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার আছে নামমাত্র, সেখানে সর্বহারার পার্টিকে *'শুরু থেকেই'* জনগণকে, অর্থাৎ বিশেষত কৃষকদেরকে সশস্ত্র সংগ্রামে সমবেত করতে হবে, এবং তা করতে হবে পিছিয়ে থাকা গ্রামাঞ্চলকে মূল কর্মক্ষেত্র করে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে। 'মাওবাদীরা' আইনি-সহ বিভিন্ন গণসংগ্রামকে কিন্তু চারু মজুমদারপন্থী নকশালপন্থীদের মতো পুরোপুরি বাতিলও করেন নি, বরং সেজন্য তাঁদের মৃদু সমালোচনাও করেছেন, এবং আপ্তবাক্যের মতো মাঝেমাঝেই ''অন্যান্য গণসংগ্রামও আমাদের করতে হবে'' বলে ঘোষণাও করেছেন, কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে মূলত এবং বাস্তবত সে পথ অনুসরণের বিরোধিতাই করছেন।

মাও কিন্তু চীন বিপ্লব পরিচালনা করতে গিয়ে বার বার বলেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের উপর জোর দেওয়া মানে কোনো-ক্রমেই আইনি-সহ অন্যান্য পন্থাকে অবহেলা করা নয়, অন্যান্য পন্থার সঙ্গে সমন্বয় না ঘটাতে পারলে সশস্ত্র সংগ্রাম কখনোই বিজয় অর্জন করতে পারবে না। মার্কস থেকে মাও তাঁদের বিভিন্ন লেখায় আর একটি কারণেও গণসংগঠন ও গণ-আন্দোলনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আশু স্বার্থভিত্তিক গণআন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হলে জনগণের শ্রেণী চেতনা বাড়িয়ে তোলে, বিপ্লবী লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রস্তুতি ও আকাঙ্খা বাড়িয়ে তোলে। *বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের আর্থিকস্বার্থের জন্য লড়াই করতে গিয়ে ভবিষ্যতেরও প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রস্তুতি গড়ে তোলে* (মার্কস:*কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*)। কেননা, একমাত্র এই সব লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই শোষিতশ্রেণী বিপ্লবের জন্য শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। তাই এই সব লড়াইকে বিপ্লবী লড়াই থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন বা বৈপরীত্যমূলক হিসেবে দেখা উচিত নয়। সেকারণেই *যে বিপ্লবীরা সমস্ত ধরনের আইনি-বেআইনি লড়াইয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারে না, তারা সত্যিই খারাপ (poor) বিপ্লবী* (লেনিন)। সবচেয়ে বড়ো কথা, যেমন মাও বার বার জোর দিয়ে বলেছেন, বিপ্লবের সাফল্য ও ধারাবাহিকতার জন্য কমিউনিস্টদের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক হচ্ছে 'জনগণের কাছ থেকে নিয়ে আবার জনগণের মধ্যেই' যাবার লাইন, অর্থাৎ গণলাইনের (massline) পদ্ধতি ধৈর্য সহকারে অনুসরণ করা ; এবং একমাত্র জনগণের সমস্ত ধরনের আন্দোলনের মধ্যে থেকেই সেই লাইনের অনুশীলন করা সম্ভব। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ পর্যায়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পাঠানো বিভিন্ন পরামর্শগুলির, কিংবা মাওয়ের প্রাসঙ্গিক সময়কালের রচনাগুলির তন্নিষ্ঠ অধ্যয়ন থেকেই ধরা পড়বে, 'মাওবাদীরা' যেমন দাবি করছেন— যদিও তা পুরোপুরি ঠিক নয়— ভারতে গণ আন্দোলন বা শ্রমিকআন্দোলন করার আইনি সুযোগ নেই, চীনে বিপ্লবী যুদ্ধ চলাকালে তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ছিল। তবু সেখানে কমিউনিস্টরা এমনকি প্রতিবিপ্লবী কুয়োমিন্টাংদের সংগঠনের মধ্যে ঢুকেও সে সব আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। অতীতে 'মাওবাদীরা' এদেশে অন্ধ্রপ্রদেশে ছাত্র-যুবক, শিল্পী-সাহিত্যিক, শ্রমিক, এমনকি মানবাধিকার-কর্মীদের মধ্যে বিরাট সংগঠন গড়ে তুলেছেন, কিন্তু সেগুলি ছিল প্রায় সিপিআই(এম)-এর নিয়ন্ত্রিত গণসংগঠন-গুলির মতোই, পার্টির প্রায় প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীন। এবং সম্প্রতিকালেও লালগড়ে মূলত জনগণেরই উদ্যোগে ও তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা ব্যাপক ভিত্তিক আন্দোলনকে তাঁরা, নিজেদেরই প্রকাশ্য স্বীকৃতি অনুসারে, নিজেদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অর্থে গণউদ্যোগ গড়ে তোলার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার পরিচয় তাই তাঁরা দিতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁদের রণনীতি ও রণ-কৌশল সংক্রান্ত দলিলে তাঁরা গণআন্দোলন বলতে বুঝেছেন, শ্রমিক-কৃষক-সহ ও অন্যান্য স্তরের মেহনতি মানুষদের আন্দোলন-গুলিকে মূলত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সহায়ক হিসেবে। ফলত এই সব আন্দোলনগুলিতে সমর্থন বা ভয়-ভীতিতে জনসাধারণ কম-বেশি সমবেত হলেও, সেগুলির মধ্যে দিয়ে গণলাইনের মাও-বর্ণিত অনুশীলন ঘটে নি, তাই জনগণের শ্রেণীচেতনা বাড়িয়ে তোলার, বা বিপ্লবী লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রস্তুতি ও আকাঙ্খা বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে, শেষ বিচারে, এগুলির পক্ষে প্রত্যাশিত ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হতে পারে না।

পাঁচ

'মাওবাদীদের' বিচারে, ভারতের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রাক্-বিপ্লব চীনের মতো। তাই তাঁদের মূল রণনীতি চীন বিপ্লবের মতো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত কি আদৌ বাস্তবসম্মত? কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও, এই দুই অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের মূলত সাদৃশ্যের পূর্ব-অনুমানটিকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। আর *'চীনে কেন রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকতে পারে'*— সে সম্পর্কে মাও যে দু'টি মৌলিক কারণের কথা বলেছিলেন (এলাকাভিত্তিক প্রায়-বিচ্ছিন্ন কৃষি-অর্থনীতি এবং প্রভাবাধীন এলাকাগুলিকে ভাগ করে নেবার সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া), ভারতে সেই কারণ দু'টি মূলত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে কীভাবে চীন বিপ্লবে অনুসৃত রণনীতি এখানে মূলত প্রযুক্ত হতে পারে?

মাও বলছেন : চীনে সেখানেই প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকতে পারে এবং দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে গণসংগ্রাম চলেছে, শ্রমিক-কৃষকরা বারবার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক লড়াই চালিয়েছে।এবং চীনের মতো দেশে, যেখানে যুদ্ধই লড়াইয়ের মূল রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানেও যুদ্ধ-পূর্ব সময়কালের গণসংগঠন ও গণ-আন্দোলনগুলি যুদ্ধ শুরু হবার 'প্রস্তুতি'র কাজ করে। *এটা খুবই স্পষ্ট যে, (সেই) প্রস্তুতিপর্বে গণআন্দোলন হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান রূপ আর গণসংগঠন হচ্ছে জনগণকে সংগঠিত করার সংগঠনের প্রধান রূপ*। অথচ 'মাওবাদীরা' তাঁদের পূর্বোল্লিখিত দলিলে বলছেন : গণসংগঠন ও গণআন্দোলনগুলি ধীরে ধীরে সশস্ত্র লড়াইয়ের দিকে যেতে পারবে— এই চিন্তা ভুল। সত্যিই এটা একটা ট্র্যাজেডি যে, যাঁরা এদেশে নিজেদেরকে 'মাওবাদী' বলে দাবি করেন, তাঁদের কাছেই মাওয়ের এই সুস্পষ্ট বক্তব্য স্পষ্ট হয় নি!

মাও আরও বলছেন : *চীনে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোনো গণতন্ত্র নেই, আছে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা নেই ... ব্যবহার করার মতো কোনো পার্লামেন্ট নেই এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটে সংগঠিত হবার কোনো আইনি অধিকার নেই*। এই পটভূমিকাতেই তিনি চীন বিপ্লবের রণনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। এই বর্ণনা কি ভারতের সম্পর্কে মূলত খাটে?

আন্দোলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে কী কী গণতান্ত্রিক অধিকার এদেশে কার্যকর নয় সেকথা অবশ্যই বলতে হবে, কিন্তু তাই বলে "*কোনো গণতন্ত্র নেই*" বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, প্রাক্-বিপ্লব চীন সম্পর্কে আমাদের সামান্যতম ধারণা নেই, আমরা সারা পৃথিবীর খোঁজ রাখি না। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় আমরা অবশ্যই যে বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করি, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে কে বা কারা আমাদের শাসন করবে— পাঁচ বছর অন্তর ভোটের মাধ্যমে আমরাই সেটা অনেক পরিমাণে ঠিক করে দিতে পারি। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটাবার মতো প্রায়-অসম্ভব কাজটি এদেশের আপামর জনসাধারণই ঠিক করে দিতে পেরেছিলেন। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর 'অক্ষয়' শাসনের অবসান ঘটাবার মতো অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটবার যে প্রক্রিয়া ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে— স্বয়ং 'মাওবাদী' নেতা কিষেণজী যাকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানিয়েছেন— তারও মূল চাবিকাঠিটি কিন্তু রয়েছে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণেরই হাতে। তাহলে? কীভাবে প্রাক্-বিপ্লব চীনের পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতি একই রকম বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাবে?

এই প্রসঙ্গেই সংসদীয় নির্বাচন নিয়ে 'মাওবাদীদের' অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। তাঁরা তাঁদের দলিলে বলছেন: *মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা বয়কটের প্রশ্নটি রণকৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের আবির্ভাবের পর, সংসদীয় পথ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ যখন আধুনিক সংশোধনবাদীদের রণনীতি হয়ে উঠেছে, তখন এই প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে আমরা আর রণকৌশল বলে ছেড়ে দিতে পারি না। কাজেই, এ কথা বলা ভুল হবে যে, দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রণনীতির পক্ষে সহায়ক হলে অন্য সব রণকৌশলের মতো এই রণকৌশলকেও আমরা ব্যবহার করতে পারি।* স্পষ্টত তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে, তাঁরা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ধ্রুপদী অবস্থানের বিপরীত কথা বলছেন। তাঁদের মতে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা উঠতে পারে শুধু সেইসব দেশে, যেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে। বস্তুত 'মাওবাদীদের' এই তত্ত্ব 'বাম' অবস্থান থেকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও বিপ্লবী অনুশীলনের অভিজ্ঞতার এক ধরনের 'সংশোধন'-প্রচেষ্টামাত্র। তাঁরা আরও দাবি করছেন যে, (এক) *বিপ্লবের বিষয়গত শক্তি এখন যখন দুর্বল, সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তোলার মতো অবস্থায় নেই, তখন নির্বাচনী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের শক্তি ও চেতনা বাড়িয়ে যেতে হবে* — এই বক্তব্য ভুল; কেননা *নির্বাচনী লড়াই বিপ্লবের বিষয়গত শক্তির বিকাশে আদৌ সহায়তা করে না, বরং সংসদ-সর্বস্বতার মধ্যে বেঁধে ফেলে এবং বিপ্লবের কঠিন ও কষ্টকর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।* (দুই)আর *নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের মোহ ভিতর থেকে ভাঙার জন্যই তাতে অংশ নেওয়া উচিত— এই বক্তব্য আরও জঘন্য ও বিপজ্জনক*; কেননা এমনিতেই জনগণের এ-সম্পর্কে তেমন কোনো মোহ নেই। মুস্কিল হচ্ছে, এই দু'টি বক্তব্যই যে 'ভদ্রলোক'-এর, তাঁর নাম লেনিন; যাঁর মতে, তাঁদের দেশ রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ অসম্পূর্ণ ঘটে নি, তবু যিনি প্রয়োজনবোধে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিপ্লবী লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অবস্থানের পক্ষে বার বার বিতর্ক চালিয়ে গেছেন। সে-সব কথা সবারই প্রায় জানা, তাই তার পুনরাবৃত্তি না করে আমরা বরং মাওয়ের কথা বলতে পারি। আমরা আগেই দেখেছি, মাও বলেছেন: *ব্যবহার করবো এমন কোনো পার্লামেন্ট আমাদের ছিল না* (অর্থাৎ থাকলে ব্যবহার করার প্রশ্নটি তিনি উড়িয়ে দেন নি)। এমনকি ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের আবির্ভাবের পরও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত বিতর্কে চীনের পার্টির স্পষ্ট বক্তব্য ছিল: পার্লামেন্ট থাকলে প্রয়োজনবোধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা উচিত। অথচ 'মাওবাদীদের' দাবি : ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের আবির্ভাবের পর বিপ্লবীদের কাছে নির্বাচন সম্পর্কিত অবস্থান *রণকৌশলের বদলে রণনীতির প্রশ্ন* হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্টতই 'মাওবাদীদের' নির্বাচনী অবস্থান একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব, কার্যত সেটা একটা 'সংশোধনবাদী' অবস্থান, মাওসেতুং চিন্তাধারার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আগেই বলেছি, ভারতের মানুষ ১৯৭৭-এ নির্বাচনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল, বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সিপিএম অপ-শাসনের অবসান ঘটাতে চলেছে - 'মাওবাদী' নেতা কিষেণজী যাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন? সম্প্রতি-অতীতে গোপন 'আঁতাত' গড়ে 'মাওবাদীরা' অন্ধ্রপ্রদেশে নাইডু সরকারকে হটাবার, বা বিহারে লালুপ্রসাদকে এবং ঝাড়খণ্ডে শিবু সোরেনকে জেতাবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এগুলি কি দ্বিচারিতা নয়?

ছয়

এই মুহূর্তে ভারতের রাজনীতি অনেকাংশেই আলোড়িত হচ্ছে ভারতের মধ্যাঞ্চলের মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়-মহারাষ্ট্র-অন্ধ্র থেকে পূর্বাঞ্চলের উড়িষ্যা-ঝাড়খণ্ড-বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত আদিবাসী-অধ্যুষিত পাহাড়ি ও জঙ্গল এলাকাগুলিকে কেন্দ্র করে। এই অঞ্চলেই হাজার বছর ধরে বাস করে যারা, সেই আদিবাসী, বনবাসী বা গিরিজন— যে নামেই ওদের ডাকুন না কেন— সেই পঞ্চাশের দশক থেকে, এদেশে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হবার সময় থেকেই সবচেয়ে বিপন্ন, সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত উচ্ছিন্ন ও নির্যাতিত হয়েছে এরাই। দেশে উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ চললেও, কার্যত তার সামান্য আলোও তাদের জীবনে প্রায় পৌঁছোয় নি, বরং বাঁধ, কারখানা, রেলপথ আর পাকা রাস্তা যতো বেশি বেড়েছে, ততোই তাদের বিপদ বেড়েছে। 'উন্নয়ন'-এর মর্মার্থ তাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে— উচ্ছেদ। জীবিকা থেকে, জীবনধারনের সাবেকি পদ্ধতি থেকে, দেশজ সংস্কৃতি

থেকে— উচ্ছেদ। বনভূমির উপর তাদের যুগযুগান্তের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ছলে-বলে-কৌশলে। জল, জমি, নদী, মাঠ, জলাশয় জাতীয় সামাজিক সম্পত্তির উপর যেটুকু এক্তিয়ার তাদের ছিল, তা-ও কেড়ে নেবার চক্রান্ত চলছে— কখনও খনিশিল্প বা নানারকম 'উন্নয়নমূলক' কর্মসূচির অজুহাতে, এবং এই মুহূর্তে আরও ব্যাপক ও তীব্রভাবে বিশেষ আর্থিক অঞ্চল (*সেজ*) প্রতিষ্ঠার তাগিদে। সমগ্র আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি আজ পরিণত হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ধারাবাহিক লুণ্ঠন ও ধ্বংসের এক একটি নির্মম দৃষ্টান্তে। সেখানে রাষ্ট্র ও সরকারের সমস্ত বিভাগ এবং সরকারি ও সংসদীয় বিরোধী দলও অন্ধ ও বধির হয়ে রয়েছে তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা এবং বঞ্চনার ব্যাপারে— যাদের বিবেক, মানবিক চেতনা এবং মৌলিক অবস্থান নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার স্বার্থে ও প্রণোদনায়।

এবং এই আক্রমণের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়ছে। ক্রমশ দেয়ালে পিঠ-ঠেকে-যাওয়া আদিবাসীরা অস্তিত্বের তাগিদে বাধ্য হচ্ছেন রুখে দাঁড়াতে, সংঘবদ্ধ হতে, প্রাণপণ শক্তিতে প্রতি-রোধের লড়াই তীব্রতর করে তুলতে। মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশের আদিবাসীদের রয়েছে মরণপণ সংগ্রামের হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ ঐতিহ্য। লড়াইয়ের সেই আগুন নিভে যায় নি কোনো দিন কোনোভাবেই। গত কয়েক দশক ধরে তাদের জীবন ও জীবিকার উপর সরকারি মদতপুষ্ট তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির আক্রমণ যখন তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তখন সেসবের বিরুদ্ধে ব্যাপক সব গণআন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটেছে, আর তার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লড়াইয়ের সামনের সারিতে থেকেছে তারাই— দল্লী-রাজহরা, নর্মদা, রায়গড়,পস্কো, নিয়মগিরি প্রভৃতি তারই দৃষ্টান্ত। তদের সমস্ত প্রতিবাদ, আন্দোলন ও প্রতিরোধও প্রায় স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় ও কোম্পানিগুলির সন্ত্রাসী বুটের তলায়। অথচ সেগুলির অধিকাংশই ছিল মূলত গণচরিত্রবিশিষ্ট ও অহিংস। আবার সেগুলির পাশাপাশি অতীতকাল থেকেই গড়ে উঠেছে হিংসাশ্রয়ী লড়াইগুলিও। এই সব লড়াইগুলি, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত-ভাবেই ন্যায়সঙ্গত এই বিদ্রোহগুলি, আজ এক উচ্চতর মাত্রা পেয়ে গেছে।

'মাওবাদীরা' বিগত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে এই পাহাড়ি ও জঙ্গল এলাকাগুলিকে বেছে নিয়েছেন তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচি অনুসারে, রণনীতি ও রণকৌশল অনুসারে দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য। সক্রিয় সংগঠন ও প্রস্তুতি গড়ে তুলেছেন তাঁরা পরিকল্পিত ও সংগঠিতভাবে। বেশ কিছু অঞ্চলে তাঁরা কার্যকর নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছে রাষ্ট্রশক্তি। পুঁজি তথা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-প্রণোদিত শোষণপ্রক্রিয়া আদিবাসীদের অহিংস ও সশস্ত্র প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও সশস্ত্র প্রতিরোধের ফলে সংকটে পড়েছে। ফলত রাষ্ট্রও সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত শক্তি নিয়ে। পরিণতিতে এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে চলছে যুদ্ধ। চলছে বিরাট এক সামরিক অভিযান— 'অপারেশন গ্রীন হান্ট'। জারি হয়েছে ও কার্যকর হচ্ছে চরম কালা আইন— ইউএপিএ।

আমরা আগেই দেখেছি, 'মাওবাদীরা' অন্তত তাত্ত্বিকভাবে গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করছেন, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্তত প্রথম দিকে ছত্তিশগড় অঞ্চলে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আদিবাসীদের সংগঠিত করে কিছু আন্দোলনও করেছেন। বেশ কিছু জায়গায় তাঁরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, মুক্তাঞ্চল না হলেও 'গেরিলা অঞ্চল' গড়ে তুলেছেন এবং রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছেন। কিন্তু গণআন্দোলনের উপর প্রকৃত অর্থে সামগ্রিকভাবে জোর দেওয়া হয় নি। জোর দেওয়া হয়েছে যার উপর, সেটি সেই পুরোনো ব্যক্তিহত্যার লাইন। মূলত গণআন্দোলন-বিচ্ছিন্ন এই লাইন অনেক বেশি প্রকটভাবে অনুসৃত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে— লালগড় প্রভৃতি এলাকায়। লালগড়ে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যে গণজাগরণ মাথা তুলেছিল ও প্রথমদিকে ব্যাপক মানুষের সহানুভূতি পেয়েছিল, সেই আন্দোলনকে পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। তাদের নিয়ন্ত্রণে আসার ফলে সেখানকার আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন হারিয়েছে। সেখানে নিঃসন্দেহে তাঁদের পিছনে সরকারি অবহেলায় ক্ষুব্ধ এবং পুলিশি অত্যাচারে বিপন্ন ও ক্রুদ্ধ আদিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন আছে; আবার সবাই-ই যে স্বেচ্ছায় তাঁদের সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছে, ভয়-ভীতি ও বাহুবলের কারণে নয়—এমন কথাও মনে করার বাস্তব ভিত্তি নেই। শাসক দল সিপিআই(এম) ছাড়াও তাঁদের অন্যান্য বিরোধী রাজনীতির লোকদের, এমনকি বিভিন্ন নকশালপন্থীগোষ্ঠীর হলেও, কণ্ঠরোধের প্রক্রিয়া চলছে অব্যাহতভাবে। আর চলছে ধারাবাহিক ব্যক্তিহত্যার জঘন্য এক প্রক্রিয়া। তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য পুলিশ ও আধা-সামরিকবাহিনী ছাড়া সিপিআই(এম) কর্মী বা সমর্থকেরা এবং 'পুলিশের চর' হিসেবে চিহ্নিতরা। শ্রেণীগতভাবে নিহতরা অধিকাংশই কিন্তু শোষিতশ্রেণীর মানুষ। ব্যক্তিহত্যার লাইন সত্তরের দশকে নকশালপন্থীরাও ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু মূলত তাঁদের লক্ষ্য হতো 'শ্রেণীশত্রু' হিসেবে চিহ্নিতরাই । এখানে কিন্তু শ্রেণীপ্রশ্নটি মূলত গুরুত্ব পাচ্ছে না। বস্তুত 'মাওবাদীরা' যে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করছেন, তা কার্যত সিপিআই(এম)-এর ক্ষমতামদমত্ত পার্টিতন্ত্রেরই একধরনের — যদিও অনেক স্থূল ও সশব্দ — পুনরাবৃত্তি। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে শিক্ষককে হত্যা, শিশুর সামনে তার বাবা-কাকাকে হত্যা, মাঝে মাঝে এমনকি শত্রু নিধন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে হত্যা তো সর্বত্রই প্রায় চলছে। মাও কিন্তু চীন বিপ্লব চলাকালীন বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তাঁরা ব্যক্তিহত্যা সমর্থন করেন না। চীন বিপ্লব চলাকালীন তাই ব্যক্তিহত্যার ঘটনা ঘটেছে যথাসম্ভব কম, তা-ও বহু সময়ে সেটা ঘটেছে শোষিত নিপীড়িত মানুষের চাপে। আর ভারতে তাঁর নামে জয়ধ্বনি তুলতে তুলতে তাঁর নামাঙ্কিত 'মাওবাদীরা' এতো ব্যক্তিহত্যার ঘটনা ঘটাচ্ছেন যে তার হিসেব রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। দু'দশকের বেশি সময় ধরে চলা চীন বিপ্লব বিজয় অর্জন করার জন্য কতোগুলি ব্যক্তিহত্যা ঘটেছিল, তার যদি কোনো হিসেব করা যায়, তবে সুনিশ্চিতভাবেই ধরা পড়বে

— এখনও পর্যন্ত বিজয় অর্জন করার ধারে-কাছে নেই যাঁরা, সেই 'মাওবাদীরা' গত দু'দশকে তার চেয়ে অনেকবেশি সংখ্যায় ব্যক্তি হত্যা ঘটিয়েছেন। তার ফলে বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে— এরকম সিদ্ধান্তের পিছনে আর যাই থাক, অন্তত সমাজ-বিপ্লবের দ্বান্দ্বিকতার সম্যক উপলব্ধি যে নেই, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ-প্রসঙ্গে দু'টি কথা বলা দরকার মনে করছি। প্রথমত, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ পুঁজিবাদের অবসানের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজবিপ্লবের আবশ্যিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অর্থনীতির সবচেয়ে অগ্রসর রূপের সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যক্তিগত উৎপাদনের বিপরীতে যৌথস্বার্থ, সংগঠন ও শৃঙ্খলার তীব্র বোধ এবং নিজেদের মুক্তির জন্য সমস্ত শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটানোর দূরায়ত লক্ষ্যের সচেতন উপলব্ধিই শ্রমিকশ্রেণীকে অন্যান্য সমস্ত শ্রেণী থেকে আলাদা করে দেয়। সে কারণেই বামপন্থা বিপ্লবের বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে সমস্ত কমিউনিস্টদের, বিশেষত তাদের নেতৃত্বকারীদের শ্রমিকশ্রেণীর চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠাটাকে আবশ্যিক একটি পূর্বশর্ত হিসেবে হাজির করে। সেজন্যই রাশিয়ায় তো বটেই, এমনকি আধুনিক শিল্প বিকাশ যেখানে প্রায় ঘটেই নি, ফলত শ্রমিকদের সংখ্যা ও আন্দোলন ছিল খুবই সীমিত, সেই চীনেও যাঁরা প্রথম থেকে বিপ্লবের নেতৃত্বে এসেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্বে শ্রমিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা অর্জনের লড়াই চালিয়েছেন। কিন্তু আজকে যে 'মাওবাদীরা' ভারতীয় রাষ্ট্রকে পর্যন্ত তটস্থ করে তুলেছেন, সমাজ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের আবশ্যিকতার কথা তাঁদের দলিলে তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করলেও, শ্রমিকআন্দোলন-সহ সমস্ত গণআন্দোলন কার্যত বয়কটের ফলে তাঁদের প্রায় কারোরই শ্রমিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা সুযোগই পান নিশ্রেণীগতভাবে সর্বহারাকরণের (proleterisation)। পরিণতিতে সম্ভাবনা এটাই যে, নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিতরা শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত, কৃষক বা খুব বেশি হলে লুম্পেন সর্বহারাদের মধ্যে থেকে উঠে আসা বিপ্লবীরা। ফলত এই নেতৃত্বের কাছে শ্রেণীচেতনার প্রতিফলন প্রত্যাশা করার যুক্তি থাকেছে না।

দ্বিতীয়ত, সমাজ বিপ্লবোত্তর নতুন সমাজে রাষ্ট্র ও উৎপাদনের শুধু মালিকানাই নয়, নিয়ন্ত্রণও মেহনতি মানুষের কাছে হস্তান্তরিত হওয়াটা আবশ্যিক। কারণ বিপ্লব বিজয় অর্জন করলেও, রাষ্ট্র ও উৎপাদনের ক্ষমতা তথা নিয়ন্ত্রণ সরাসরি মেহনতি মানুষের হাতে আসে না— আসে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে পার্টির হাতে। সমাজতন্ত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ধরা পড়েছে, ক্ষমতা পার্টির হাতেই থেকে যাবার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত একদিকে মেহনতি মানুষের মধ্যে ব্যাপকতর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বদলে তারা ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা ও উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; অন্যদিকে পার্টির মধ্যেকার অধঃপতিত বা নতুন উদ্ভূত বুর্জোয়া উপাদানেরা সমস্ত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ দখল করে নিয়েছে। এই আশংকার কথা মাথায় রেখেই কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতাবিহীন প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন প্রথম থেকেই মেহনতি জনতার প্রতিনিধিদের (অর্থাৎ পার্টির) হাত থেকে সরাসরি মেহনতিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার প্রক্রিয়া গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়া সফল হয়নি, পরিণতিতে সেই দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই মাও সেতুং বিপ্লবের ১৭ বছর পরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন করে মেহনতি জনতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। সেই প্রক্রিয়া চীনের বিপ্লবীরা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে পারেননি, ফলে সেদেশেও ক্রমে পুঁজিবাদী পথযাত্রীরা সমস্ত ক্ষমতা দখল করেছে। বস্তুত সারা দুনিয়া জুড়ে বামপন্থার প্রথম বিজয়সূচক পদক্ষেপ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অনুশীলনগুলি বিধ্বস্ত হয়ে যাবার পরে সঠিকভাবেই এই উপলব্ধি গড়ে উঠেছে যে, আজকের দুনিয়ায় সমাজ-বিপ্লবের নতুন প্রচেষ্টা শুরু করতে গেলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগেই নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যেকার,এবং বৃহত্তর পটভূমিকায় পার্টি ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা—অর্থাৎ এক কথায় ব্যাপক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সমস্যার সমাধান করার প্রক্রিয়া — চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে পার্টির মধ্যে, কিংবা বিপ্লবোত্তর সমাজে মেহনতিদের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রশ্নটির সঠিক সমাধান করা যায়। প্রাক্-বিপ্লব পর্বেই 'মাওবাদীদের' কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই প্রক্রিয়া দূরের কথা, তার উপলব্ধি বা চেতনা আছে বলে প্রমাণ মেলে নি, বরং অনেক বেশি ধরা পড়েছে বিরোধী মতের লোকদের কণ্ঠরোধ করার প্রবণতাই । সত্যিই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারলে কোন্ গণতন্ত্র তাহলে তাঁরা কার্যকর করবেন?

আর সেকথা যদি আপাতত না-ও তুলি, তবু অন্যদিকে, ভারতের মধ্যাঞ্চলের ওই সব জঙ্গলমহলের বাইরে রয়ে গেছে প্রায় ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা বিশিষ্ট যে বিশাল ভারত, 'মাওবাদীদের' অনুসৃত 'সশস্ত্র বিপ্লব' কোনোক্রমেই যেখানে এখনও পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই, প্রতিদিন শ্রমিক-কৃষক-সহ ব্যাপক মানুষের তীব্র শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হবার পাশাপাশি যেখানে এখনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের অন্তত কিছু সুযোগ ও অবকাশ রয়েছে, এবং মানুষ সেখানে বহু সময়েই স্বতঃস্ফূর্ত বা সংগঠিত প্রতিবাদে ফেটে পড়ছেন, অনেক সময়ে ভোট দিয়ে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে জিতিয়েও আনতে পারছেন, এমনকি সময় সময় নিজেদের অপছন্দের শাসকদলকে পর্যন্ত গদি থেকে টেনে নামাতে পারছেন অস্ত্র ছাড়াই, ভোটের মাধ্যমে — সেখানে এই 'মাওবাদীদের' কোনোই সক্রিয় ভূমিকা নেই, নিজেদের সমর্থনে কিছু মিটিং, মিছিল বা টাকা তোলার কাজ ছাড়া। সেই ৯০ শতাংশ ভারতকে কার্যত বাদ দিয়ে ভারতে সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত করা সম্ভব— এমন দাবি নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। তাহলে

তাদের শুদ্ধু ধরে যে সমগ্র ভারত, সেখানে তাঁদের নিজস্ব রণনীতি ও রণকৌশল অনুসরণ করে সমাজ-বিপ্লবের পুরোধা হবেন আজকের 'মাওবাদীরা'— এই চিন্তারও কোনো সারবত্তা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইতিহাস বিভিন্ন দেশে বারবার প্রমাণ করেছে যে, একদিকে যেমন আত্মত্যাগ আর বিপ্লব সমার্থক নয়, ঠিক তেমনি রক্তপাত ঘটানোর আধিক্যের মধ্যেও নিহিত নেই বিপ্লবের বিজয়ের বেশি সম্ভাবনা। বরং মূল কথাটি অনেক আগেই বলে গেছেন সেই মহান বিপ্লবী, যাঁর নাম 'মাওবাদীরা' নিজেদের দলের নামের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন, অর্থাৎ মাও সেতুং : *লাইনের সঠিকতা বা বেঠিকতার* উপরই *নির্ভর করে বিপ্লবের সাফল্য*। সব মিলিয়ে তাই নিঃসন্দেহে এক কথায় বলা যায়, 'মাওবাদীরা' অবশ্যই তাঁদের আত্মত্যাগের জন্য আমাদের সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা অর্জন করছেন, কিন্তু তবুও মাও সেতুং-এর বিপ্লবী তত্ত্ব ও অনুশীলনীর মূলত বিরোধী তাদের উগ্র 'বাম' দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ যতোদিন তাঁরা বর্জন না করবেন, ততোদিন বিপ্লবী লড়াইয়ের সর্বাত্মক বিকাশে ,শেষ বিচারে, কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন না। তাই বলে, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সহাবস্থান করছে যে সিপিআই এম, তার সঙ্গে বিপ্লবের লক্ষ্যে সক্রিয়তা দেখাবার 'অপরাধে' রাষ্ট্রশক্তির ও একচেটিয়া পুঁজির চরম সন্ত্রাসের শিকার এই 'মাওবাদীদের' সমান দৃষ্টিতে দেখলেও অবশ্যই চলবে না। ভারতে এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে রাষ্ট্রের নৃশংস আক্রমণ ও বিপুল সংখ্যক আদিবাসীদের শোষণ-নিপীড়ন-যন্ত্রণা ও প্রতিরোধের কথা দেশের রাজনীতির পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার জন্য অবশ্যই তাঁদেরকে নৈতিক সমর্থন ও অভিনন্দন জানাতে হবে আমাদের , কিন্তু তাই বলে তাদের মৌলিক ভ্রান্তির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলেও,বা দেখেও চুপ করে থাকলে চলবে না।

আজ এই মুহূর্তে এই বিষয়টিই এদেশে নিজেদের চেতনা ও মানবিক বোধকে পুঁজির পদতলে বিসর্জন দেন নি এরকম ব্যাপক মানুষের বিশেষ মনোযোগ দাবি করছে। চলমান এই লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায়, সে হিংসাত্মক বা অহিংস যা-ই হোক না কেন, বা সে সব লড়াইয়ে যতো ভুল ও বিচ্যুতিই থাক না কেন, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে সেগুলির পাশে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, দাবি তুলতে হবে রাষ্ট্রীয় অভিযান বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উপর। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই লড়াইয়ে গণ-নির্ভরতার বদলে বন্দুক-নির্ভরতার উপর একপেশেভাবে জোর দেবার লাইন, ব্যক্তিহত্যার লাইন এবং বিরোধীদের মতামতের ও রাজনীতি করার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের লাইন অনুসরণের বিরুদ্ধে সমালোচনা চালিয়ে যেতে হবে। বিশেষভাবে জোর দিতে হবে শ্রেণী-প্রশ্নটিকে অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলা করার বিপজ্জনক প্রবণতার সমালোচনার উপর। লড়াইয়ের স্বার্থে সেই সব সমালোচনা করাটাকে তাঁরা তাঁদের অভ্যেসমতো 'রাষ্ট্রীয়' চরিত্রবিশিষ্ট বলে কুৎসা করলে বা আক্রমণ-যোগ্য বলে চিহ্নিত করলে সেটাও কিন্তু আরেকটি ভ্রান্ত প্রবণতার স্বাক্ষর রাখবে। কেননা, শেষ বিচারে, ইতিহাস তৈরি করেন জনগণই, বন্দুক বা অস্ত্র নয়। গণ-নির্ভরতা, বা মাও-এর ভাষায় বলতে গেলে, 'জনগণ থেকে জনগণের মধ্যে'-র গণলাইন ছেড়ে, লড়াই কিন্তু কোনো দিন কোনো দেশে জয়যুক্ত হয় নি। সমাজ-বিপ্লবকে যাঁরা সমর্থন করেন, তার পক্ষে দাঁড়াতে বা তার অনুকূলে ভূমিকা নিতে চান, তাঁদের তাই আজ জরুরি দায়িত্ব এই কথাটা সোচ্চারে ঘোষণা করা যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অতীত ও সাম্প্রতিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতার আলোকে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সেতুং চিন্তাধারার ভিত্তিতেই কেবল অগ্রগতি ঘটতে পারে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত বিপ্লবী লড়াইয়ের — লাইন ভুল হলে শত শুভেচ্ছা বা আত্মত্যাগও কিন্তু বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

অনীক জুলাই : ২০১০